Chandernagar Kanailal Vidyamandir

(French Section)

(Secondary Level)

School E-Magazine

"ABHIJAN"

Academic Year: 2026

President:
Dr. Somnath Chattopadhyay — Headmaster

Editors:
Mr. Bhabesh Mandol, Assistant Teacher
Mrs. Achira Dutta, Assistant Teacher
Mrs. Sayantika Das, Assistant Teacher
Mr. Saurabh Mukhopadhyay, Assistant Teacher
Mr. Santanu Ghosh, Assistant Teacher

With the Cooperation of
All teachers, teaching staff, non-teaching staff, and students of the school.

Special Contribution by:
Akash Mukherjee, Priyanshu Pal, Soumik Saha, Jaydeep Rakshit
(Students of Class X)

সূচিপত্র

সরস্বতী পূজা	প্রিয়ম বাড়ুই (তৃতীয় শ্রেণি)	3
ছাত্রজীবনে সরস্বতী পূজা	শুধাংশু বোস (চতুর্থ শ্রেণি)	3
আমার মাতৃভাষা বাংলা	স্বর্ণদ্বীপ মজুমদার (পঞ্চম শ্রেণি)	3
আবেদন	সমদর্শী পাঠক (পঞ্চম শ্রেণি)	4
সরস্বতী বন্দনা	অর্ণব পাল (পঞ্চম শ্রেণি)	4
আমার প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	রূপম সাহা (ষষ্ঠ শ্রেণি)	4
দেশপ্রেমিক আত্মা	হিমাংশু গেঁড়ি (ষষ্ঠ শ্রেণি)	5
পাখা	রাতুল ভট্টাচার্য (ষষ্ঠ শ্রেণি)	5
অমর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত	শুভ্রনীল মুখার্জী (ষষ্ঠ শ্রেণি)	6
একটি ঘটনার আলোকে নিজেকে চেনা	অর্ণব কুমার সাউ (সপ্তম শ্রেণি)	6
বারাটাং – এ একদিন	আর্য সরকার (অষ্টম শ্রেণি)	7
চিত্রাঙ্কন	শ্রবণ কুমার দাস (দশম শ্রেণি)	8
শিক্ষক দিবস	সায়ন চ্যাটার্জী (অষ্টম শ্রেণি)	9
সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব	অর্ণব দত্ত (অষ্টম শ্রেণি)	9
আমারো কান্না পায়	মহঃ আরজু (অষ্টম শ্রেণি)	9
Saraswati Puja: A Day for Wisdom and Learning	Ansh Paswan (Class VIII)	10
চন্দননগরের ঐতিহ্যমন্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজার অতীত ও বর্তমান	জিৎ সেন (নবম শ্রেণী)	11
স্বপ্ন	সৌমিক সাহা (দশম শ্রেণী)	11
চিত্রাঙ্কন	শুভম অধিকারী (দশম শ্রেণি)	12
থিয়েটারের ভৌতিক রহস্য	জয়দীপ রক্ষিত (দশম শ্রেণী)	12
রাহুলের মোবাইল: আলো ও অন্ধকারের মধ্যে এক কিশোর:	শান্তনু ঘোষ (সহ শিক্ষক)	13
The Restless Mind and the Lost Art of Attention	Saurabh Mukhopadhyay, Asst. Teacher	16
চারুলিপি বা ক্যালিগ্রাফি: হাতে লেখা সংবাদপত্র	পিংকি দাস (সহ শিক্ষিকা)	17
মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া	ড: সোমনাথ চ্যাটার্জি, (প্রধান শিক্ষক)	18
Annual Sports: Photographed by	Santanu Ghosh	20
Annual CEPE Certification Programme: Photographed by	Santanu Ghosh	22

সূচিপত্র

প্রিয়ম বাড়ুই (তৃতীয় শ্রেণি)

বিদ্যার দেবী সরস্বতী। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বাড়িতে এই পূজা করে। দেবীর রঙ শুভ্র, দেবীর বাহন রাজহাঁস, দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম। দেবীর এক হাতে বীণা, অপর হাতে থাকে বই। দেবী সর্বদা বীণাপানি ও বাগদেবী নামে পরিচিত। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দেবীর পূজা হয়। পূজার দিনে ছাত্র ছাত্রীরা খুব ভোরে উঠে স্নান করে পাঞ্জাবি পরে ফুল নিয়ে বিদ্যালয়ে যায়। দেবীর সামনে বইখাতা, কলম পুরোহিত মশাই কে দিয়ে পূজা করানো হয়। তারপর অঞ্জলি দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা দেবীর কাছে বিদ্যার জন্য প্রার্থণা করে। এইভাবে পূজা শেষ করে সব বন্ধুরা মিলে ঠাকুর দেখতে যায়। আবার কেউ ঘুড়ি ওড়ায়। এইভাবে সরস্বতী পূজা পালন করা হয়।

ছাত্রজীবনে সরস্বতী পূজা
শুধাংশু বোস (চতুর্থ শ্রেণি)

সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মের একটি গুরুর্ত্বপূর্ণ উৎসব। বিদ্যার দেবী সরস্বতী। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বাড়িতে এই পূজা করে। দেবীর রঙ ও বসন শুভ্র। দেবীর বাহন শ্বেত রাজহংস এবং আসন পদ্ম। দেবীর এক হাতে বীণা ও অপর হাতে বই। দেবী সরস্বতী সারদা, ভারতী ও বাগদেবী প্রভৃতি নামে পরিচিত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দেবীর পূজা হয়, এটি একদিনের পূজা হলেও পূজার কয়েকদিন আগে থেকেই আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। পূজা মন্ডপ তৈরি, সাজানো, প্রতিমা আনা এসব চলতে থাকে। পূজার দিন ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যুষ্যে উঠে স্নান করে ফুল নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হয়। দেবীর সামনে বই, খাতা, কলম রাখে। ছাত্র ছাত্রীরা উপোস থেকে দেবীর চরণে পুস্পাঞ্জলি দেয়। স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, বাড়ির পূজায় শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, সকলেই অংশ নেয় ও আনন্দ উপভোগ করে। সরস্বতী পূজার খরচ খুব কম। তাই এই পূজার সংখ্যা খুব বেশি। বিদ্যার সাথে সম্পর্ক নেই, এমন প্রতিষ্ঠানেও আজকাল সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে।

আমার মাতৃভাষা বাংলা
স্বর্ণদ্বীপ মজুমদার (পঞ্চম শ্রেণি)

জন্মের কয়েকমাস পর আমাদের মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তা হল মাতৃভাষা। হ্যাঁ ঠিক, মাতৃভাষা মানে আমার মায়ের ভাষা। জীবনের প্রথম শিক্ষক হল আমার বাবা এবং মা হলেন প্রথম শিক্ষিকা। এই ভাষাকে আমি এতটাই ভালবাসি যে আমি ইংরেজি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ার পর আবার বাংলা স্কুলে ক্লাস ওয়ানে মানে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হই। ছোট বেলা থেকে হিন্দি ও ইংরাজি পড়তে ভাল লাগলেও সেই ভালোবাসা আমার ছিল না। প্রথম শ্রেনিতে ভর্তি হয়ে প্রথম আমি এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে ‘অ’ –‘আ’ লেখা শিখি। আমার সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জানাই আমার প্রণাম। যারা আমার এই শিক্ষা জীবনের পথকে এত সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি বলতে ভালবাসি যে আমি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংলা ভাষায় জুড়ে আছে আমার মন প্রাণ। সবথেকে বড়ো কথা “আমি বাঙালি আমি বাংলাকে ভালবাসি .....।”

আবেদন

সমদর্শী পাঠক (পঞ্চম শ্রেণি)

বসন্ত ঋতু, শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথি
আমাদের মাঝে বিরাজ করেন শ্রী শ্রী সরস্বতী।
বিদ্যার দেবী তুমি দিয়ে যাও জ্ঞান
যে -যার মত, সেই সব করি আহরণ।
হস্তে তোমার বীণা আর পুস্তক
বাহন রাজহংস।
চোখ জুড়ানো রূপ যে তব
পরনে শ্বেত -শুভ্র বস্ত্র।
স্কুলের পুজো, বাড়ির পুজো, পাড়ার পুজো
সব ঠাকুরই দেখা চাই।
সবার কাছে গিয়ে করি এই আবেদন
বছর টা যেন ভাল করে আমি উতরে যাই ।

সরস্বতী বন্দনা
অর্ণব পাল (পঞ্চম শ্রেণি)

শ্বেতপাথরের মূর্তি তব হাতে বীণা খানি ।
জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে দাও বিশ্ব - চরাচর
ছোট্ট আমি অর্ণব মাগো
ডাকি তোমায় সুরে, অজ্ঞানতার সব আঁধার
দাও না ঠেলে দূরে।
শুভ্র হাসির পরশ দিয়ে রেখো,
সবার মনে বিদ্যার এই আঙিনাতে
প্রণাম জানাই অনুক্ষণে।

আমার প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
রূপম সাহা (ষষ্ঠ শ্রেণি)

গত বছর পূজার ছুটিতে আমি বাবামায়ের সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রতি বছরই আমরা ওই সময়ে বেড়াতে যাই। কিন্তু এবছর আমি প্রথম সমুদ্র দেখব তাই খুব আগ্রহী ছিলাম এবং আরও একটি কারণ আমি কখনো পুরী যাইনি। আমরা হাওড়া থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেসে চড়ে দুপুর বেলা রওনা দিলাম পুরীর উদ্দেশ্যে। রাত ১০টা নাগাদ আমরা পুরী পৌঁছে যাই। সেখান থেকে একটা অটোয়ে চড়ে আমরা স্বর্গদ্বারের কাছে হোটেলে পৌঁছাই। হোটেল আগেই বাবা কলকাতা থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। ট্রেনেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম বলেই হোটেল-এ এসে হাত-পা ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে সমুদ্রের গর্জনে আমার ঘুম ভাঙল। আমাদের হোটেল এর বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যেত। বেলা হতেই বাবা – মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গেলাম। সমুদ্রের সে কি উত্তাল রূপ। বড়ো বড়ো ঢেউয়ের ধাক্কায় টাল সামলানো দায় হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যাবেলাতেও সমুদ্রের কাছে গেলাম। পরের দিন

গেলাম জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পূজা দিতে। সেদিন জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদও খেয়েছিলাম। একদিন গাড়ি ভাড়া করে বেড়াতে গেলাম উদয়গিরি, খন্ডগিরি ও সূর্যমন্দিরে পূজা দিতে। এবার ফিরে আসার পালা। বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করছিল না। ফেরার দিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম আবার কবে এখানে আমি সকলের সঙ্গে বেড়াতে আসব।

দেশপ্রেমিক আত্মা।
হিমাংশু গেঁড়ি (ষষ্ঠ শ্রেণি)

আমি ও আমার পরিবার ২০২৩ সালে সিকিম এ গরম এর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে নাথুলা পাস নামের একটি জায়গায় আমরা গিয়েছিলাম। এবং জানতে পারি সেখানে একটি বিখ্যাত বাবাজী হারভজন সিং–এর মন্দির আছে। সেখানে আমরা গিয়ে জানতে পারি ১৯৬৭ সালে এক সৈনিক টুকুলা থেকে চনচুইলা যাওয়ার পথে ঘোড়া সমেত এক খাদে পড়ে যান। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তার মৃত দেহ তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই অনেকে ভেবেছিলেন যে তিনি হয়তো পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনার কয়েকদিন পর তার এক সঙ্গীকে স্বপ্নে এসে তিনি বলেন যে তার মৃত্যু ঘটেছে। এবং তিনি মৃতদেহের সন্ধান দেন। সেখান থেকেই তার দেহ পাওয়া যায়। তার মৃত্যুর ৫৯ বছর পরও তিনি চিন ও ভারতের সীমানায় পাহারা দিয়ে চলেছেন। কোনো সৈন্যের সাথে কোনো খারাপ দুর্ঘটনা হওয়ার আগেই তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেন। সেখানে অনেক সৈনিকেই বলে যে তারা বাবাজীকে ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দিতে দেখেছেন। এবং তার সমস্ত দরকারি বস্তু যেমন ছুরি, পাগড়ী, জামা, জুতো তলোয়ার, ব্যাচ ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নাথুলা পাসের সেই মন্দিরে রাখা আছে। অনেক সৈনিক বলেন সেই মন্দিরে থাকা বিছানায় কেউ যেন এসে বিশ্রাম করে তাই তার বিছানা এলোমেলো থাকে। তার জুতোয় প্রতিদিন কাদা লেগে থাকে তাঁর একটি মূর্তি ও একটি ছবি রাখা হয়েছে। সেখানে সৈনিকরা পূজা করে তাঁকে প্রতিদিন। এছাড়াও চিন ও ভারতে কোনো মিটিং হলে একটি করে বসার সিট ফাঁকা রাখেন বাবাজীর জন্য। তিনি অনেক সৈনিককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এমন এক মহান দেশপ্রেমিক – এর সর্ম্পকে জেনে আমি ও আমার পরিবার ধন্য হয়েছি। আমার ভারতীয় সৈন্যের প্রতি ভালোবাসা শতগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। " জয় হিন্দ।"

পাখা
রাতুল ভট্টাচার্য (ষষ্ঠ শ্রেণি)

তালপাতার তৈরি তুমি
নামটি তোমার পাখা।
গরম কালে আরাম দাও,
শীতকালে নেই দেখা।
পাখা তুমি কার?
গরম লাগে যার!
পাখা জন্ম তোমার কোথায়?
ওই তালগাছের মাথায়।

অমর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত
শুভ্রনীল মুখার্জী (ষষ্ঠ শ্রেণি)

ভারতের ইতিহাসের এক অতুলনীয় এবং অমর বিপ্লবী হল কানাইলাল দত্ত। এই বীর ১৮৮৮ সালে ৩০শে আগস্ট চন্দননগরে সরিষাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম চুনিলাল দত্ত এবং মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী। তিনি বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়–এর কাছে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী হন। তিনি বড়াইচণ্ডিতলার প্রবর্তক আশ্রমে মতিলাল দত্তের কাছে লাঠি খেলা ও উত্তরে বিপ্লবী শ্রীষচন্দ্র ঘোষ-এর আখড়ায় বন্দুক চালানো শিখতেন। পরে তিনি আলিপুর বোমা মামলায় ধরা পড়েন এবং তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গী হন উপেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়, ঋষিকেশ কাঞ্জীলাল, হেমচন্দ্র দাস ও আরও অনেকে। তাঁদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে তাঁদেরই সাথি নরেন গোস্বামী ধরা পড়ে গেছেন এবং সে ফাঁসির ভয়ে রাজসাক্ষী হয়ে বিপ্লবীদের সব গোপন কথা বলে দিয়েছে। দেশে কোথায় বোমা তৈরি হয়, কোথায় গোপন সূত্রে বন্দুক পাচার হয়। তখন কানাইলাল সহ সবার নরেন এর ওপর খুব রাগ হয়। তাই তাঁরা নরেন কে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে।

যেই হাসপাতালে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে নরেন গোস্বামী ভর্তি ছিল সেখানে বিপ্লবী সতেন্দ্রনাথ দত্ত শরীর খারাপ এর অজুহাতে ভর্তি হয় এবং তাঁর সাথে কানাইলাল-ও থাকে। একদিন ছলেবলে সত্যেন এবং কানাই নরেনকে তাঁদের ঘরে ডাকে। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ তাকে চারটে গুলি পা লক্ষ্য করে শুট করে এবং কানাই দুটো গুলি নরেনের বুক লক্ষ্য করে শুট করে। তখন নরেন গোস্বামী এর মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে তাদের এই কর্ম দেখে সত্যেন্দ্রনাথকে ফাঁসি দিয়ে দেন এবং কানাইলাল দত্ত-কেও কিছুদিন জেলে রাখার পর ফাঁসি দেন। ফাঁসি দেওয়ার আগে তিনি "বন্দেমাতারম" বলে হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেন। কিন্তু তিনি আজও সবার মনে অমর হয়ে আছেন। আমরা ভারতবাসীরা সবসময়ের জন্য এই কামনা করি যে তিনি যেখানেই থাকুক ভাল থাকুক।

একটি ঘটনার আলোকে নিজেকে চেনা
অর্ণব কুমার সাউ (সপ্তম শ্রেণি)

নিজেকে চেনা কোন হঠাৎ পাওয়া জ্ঞান নয়; অনেক সময় একটি ছোটো ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তেমনই একটি সাধারণ ঘটনা আমাকে নতুন করে নিজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন ছিল এক অন্যরকমের ব্যস্ত দিন। কাজের চাপ, সংসারের দায়িত্ব আর নানা মানুষের চাওয়া–পাওয়ার মাঝে আমি নিজেকে প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম । সকাল থেকে একটানা দৌড়ঝাপ, অথচ কেউ একবারও জিজ্ঞাসা করেনি আমি কেমন আছি। দিনের শেষে শরীর ক্লান্ত, মন আরও বেশি ক্লান্ত। তবু অভ্যাসের মতই সব সামলে নিচ্ছিলাম, নিজের অনুভূতি গুলোকে পাশ কাটিয়ে ।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় একটি ছোট ঘটনা ঘটল। খুব কাছের একজন মানুষ, যাকে আমি সবসময়ই আগলে রাখার চেষ্টা করতাম, সামান্য একটি ভুলের জন্য আমার ওপর বিরক্ত হয়ে পড়ল। আর কথাগুলো খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু সেগুলি গিয়ে আমার মনের ভিতর লাগল। আমি চুপ করে রইলাম । কোন প্রতিবাদ করলাম না, কোন ব্যাখ্যাও দিলাম না। শুধু মনে হল "আমি কি সত্যিই এতটাই অদৃশ্য? "

সেই রাতটায় ঘুম এলো না। বারবার ভাবতে লাগলাম, আমি কেন সবসময়ই চুপ করে থাকি? কেন অন্যের শান্তির জন্য নিজের অনুভূতিগুলোকে বির্সজন দিই? সেই প্রথম আমি নিজের দিকে গভীর ভাবে তাকালাম।

পরদিন সকালে আয়নার সামনে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক অচেনা মানুষকে দেখলাম। বাইরে থেকে সব ঠিক-ঠাক, কিন্তু ভিতরে জমে থাকা না বলা কথার-পাহাড়। সেদিন আমি ইচ্ছা করে সব থামিয়ে দিলাম। ফোনটা দূরে রেখে জানলার পাশে বসে নিজের সাথে কথা বললাম। বুঝলাম, আমি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল কিন্তু, নিজের প্রতি ভীষণ অবহেলাকারী।

এই ঘটনাটি আমাকে শিখিয়েছিল, ভালো মানুষ হওয়ার অর্থ নিজেকে মুছে ফেলার নয়। নিজের অনুভূতির মুল্য না দিলে, অন্যের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না। আমি বুঝলাম, সীমা টানা স্বার্থপরতা নয়, বরং আত্মসম্মানের চর্চা।

সেই দিন থেকেই আমি একটু একটু করে বদলাতে শুরু করলাম। সব কথা মনের মধ্যে চেপে না রেখে, প্রয়োজন হলে "না" বলতে শিখি। নিজের ক্লান্তিকে গুরুত্ব দিই, নিজের ভালো লাগাকে প্রাধান্য দিই। আশ্চর্যের বিষয় এতে সম্পর্কগুলো নষ্ট না হয়ে আরও স্পষ্ট ও সৎ হয়েছে।

একটি ছোট ঘটনা আমাকে শিখিয়েছিল সবচেয়ে বড় সত্য – নিজেকে চেনা মানে নিজের দুর্বলতা মেনে নেওয়া, আবার নিজের শক্তির ওপর ভরসা রাখা। জীবনে সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়, কিন্তু নিজের সাথে অসৎ হওয়াটা সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা।

আজ বুঝি, নিজেকে চেনার জন্য কোন বড়ো বিপর্যয় লাগে না। কখনো কখনো সাধারণ মুহূর্তেই আমাদের সামনে আয়নার মত দাঁড়িয়ে যায়। সেই আয়নার থেকে চোখ ফেরানোর সাহস থাকলেই, শুরু হয় নিজের সাথে পরিচয়ের যাত্রা।

বারাটাং – এ একদিন

আর্য সরকার (অষ্টম শ্রেণি)

মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছিল বনমানুষ থেকে অর্থাৎ যাকে বলা যায় 'Ape'। চার পা থেকে দু পা, কাঁচা মাংস থেকে আগুনে ঝলসানো মাংস এভাবেই প্রতিমুহূর্তে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের মতো আধুনিক প্রজন্মের জন্ম। কিন্তু সেই সমস্ত আদিম জনজাতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাদের একটি সম্প্রদায় 'জারোয়া' নামে আন্দামান–নিকোবর–দ্বীপপুঞ্জে আজও বিদ্যমান। আমার জীবনে প্রথম ঘুরতে যাওয়া জায়গাটি হল এই আন্দামান। এখানে বেড়াতে গিয়েই আমি প্রথম এই জনজাতিকে দেখতে পেয়েছি।

বারাটাং অর্পূব সুন্দর। যা নিজে চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আন্দামান- নিকোবর – দীপপুঞ্জ এই বারাটাং নামক স্থানটি এই 'জারোয়া' উপজাতির জন্যই সংরক্ষিত। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। এই স্থানটি বারোটি ক্যানেলের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ সমুদ্র থেকে বারোটি ক্যানেল এই ভূখন্ডকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাই এই ভূখন্ডটি বারাটাং নামে পরিচিত। আমরা আন্দামানে গিয়ে 'Port Blair'–এ একটি হোটেল এ ছিলাম। সরকারি অনুমতি নিয়ে, সকাল ৬ টায় আমরা বারাটাং–এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাই রাস্তার দুপাশে ঘন জঙ্গল। আমরা আমাদের 'Driver' কাকুর মুখ থেকে জানতে পারি যে আমরা 'জারোয়া রিজার্ভ ফরেস্ট' – এ প্রবেশ করেছি। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে নিকষ কালো একটি মুর্তি, যার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পিঠে তার তির-ধনুক। ড্রাইভার কাকু বলে উঠলেন যে, এটা মুর্তি নয় , 'জারোয়া'। গাড়ি আস্তে চালাতে বললাম, রাস্তার দু- পাশে দেখতে দেখতে আবারও দেখতে পেলাম অনেকগুলো ছোট কালো কুচকুচে 'জারোয়া'দের বাচ্ছা দৌড়ে রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। সে এক অর্পূব দৃশ্য, যা আজও আমার চোখে ভাসে।

আমরা আবার দেখতে পেলাম কিছুটা এগিয়ে, কয়েকটি 'জারোয়া' মেয়ে হাতে থাকা গাছের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে-দিকে বসে ছিলাম গাড়ির জানালাটা খোলা ছিল। একটি 'জারোয়া' মেয়ে হাতে থাকা গাছের ডাল দিয়ে সপাটে বাড়ি মারে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই জানলার কাঁচ বন্ধ করে

দিই। সারাদিন আমরা এই রকম ভাবে নানা 'জারোয়া' দেখতে পেয়েছিলাম। এরপর আমাদের ফেরার পালা। ফেরার পথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। হঠাৎ দেখি রাস্তার ওপর একটি বিশাল লম্বা সাপ শুয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজিয়ে সেই সাপটিকে সরিয়ে আবার গাড়ি চলতে লাগল। এইভাবে আমরা অনেক প্রজাপতি, সাপ রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলাম। আমার বারাটাং–র এই চাক্ষুস অভিজ্ঞতা আজীবন স্মৃতি হয়েই থাকবে।

শ্রবণ কুমার দাস (দশম শ্রেণি)

শিক্ষক দিবস
সায়ন চ্যাটার্জী (অষ্টম শ্রেণি)

ছাত্ররা আজ আসবে স্কুলে,
তোমাদের জন্য গাইবে গান।
আবৃত্তি আর নাচ গান করে,
তোমাদের জানাবে সম্মান।
তোমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে
ভালো হবে ফল।
তোমাদের দেখে ওদের চলা
স্বপ্নের ভবিষ্যত,
মানুষ গড়ার কারিগর তোমরা
আগামি পৃথিবীতে।
সদা হাস্য দেখি তোমাদের
শিক্ষা করেছ দান,
চির উজ্জ্বল শিক্ষক তোমরা
তোমাদের জানাই প্রণাম।

সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব
অর্ণব দত্ত (অষ্টম শ্রেণি)

সরস্বতী দেবী জ্ঞান, বিদ্যা ও সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী। পুরাণ মতে সৃষ্টির আদিতে যখন পৃথিবী ছিল নীরব ও অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন ব্রহ্মা দেব জগতে চেতনা জাগানোর জন্য এক দিব্য শক্তির আহ্বান করেন। সেই শক্তিরূপেই আবির্ভূত হন দেবী সরস্বতী। তাঁর হাতে থাকা বীণা সুর ও শিল্পের প্রতীক, পুস্তক জ্ঞানের এবং জপমালা সাধনার চিহ্ন। বিশ্বাস করা হয়, দেবীর বীণার সুরেই ভাষা ও সংগীতের জন্ম। তাই তাঁকে বাগ্‌দেবী বলা হয়।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আমরা শ্রদ্ধাভরে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করে থাকি। ছাত্রছাত্রীরা এই দিনে বই-খাতা দেবীর পায়ে নিবেদন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। দেবীর কৃপায় মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়। সরস্বতীর আবির্ভাব আমাদের শেখায়–শিক্ষাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই আমরা সত্য, সুন্দর ও সৃজনশীল জীবনের পথে এগিয়ে চলি।

আমারও কান্না পায়
মহঃ আরজু (অষ্টম শ্রেণি)

আমারও বড্ড কান্না পায়। তুমি কি জানো? বুঝতে পারো আর? সবার ভিড়ে বড্ড শক্ত হয়ে থাকি আজকাল। জানো আমি নাকি রাগি অবাধ্য ছেলে, কতজনই না বলে। স্কুলের স্যারেরা আমার উপর রেগে যান। বলেন আমার নাকি বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক না। জানো, আসলে কিন্তু আমি এমনটা নয়। ওরা যে কেউ বোঝেনা। আমি বোঝাতে চেষ্টা

করতে যাই, কিন্তু পারিনা। আরো ভুল বুঝে ফেলে সকলে ....। সবাই আমার আনমনা ভাব দেখে, স্কুলে এসে সাড়া স্কুলে একা ঘুরে বেড়াতে দেখে। ওনারা আমায় স্কুল কামাই করতে দেখেন, পড়াশোনার ঘাটতি দেখেন। কেউ বোঝেনা কেন এমন হচ্ছে? কেউ দেখে না? এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটার ঘর আছে তবু যেন কিছুই নেই। দিনরাত খাবার খোটা, নানান গঞ্জনা। এর যে পেটে খিদে আছে। তবুও এই মধ্যবিত্তের তকমা, ভিক্ষাবৃত্তিকে পাপ বলে। আবার কাজ করতে চাইলে শিশু শ্রমিকের কাজ নেই। অথচ খিদের জ্বালা আছে। আবার কোথাও কাজ জুটে গেলে- "ও একটা লোফার ছেলে"। সমাজ বোঝেনা কিছুই। বোঝেনা স্কুলের বন্ধুরা যখন নিজের পছন্দের জামা কিনতে পারে, কিছু ভালো লাগলে কারোর কাছে বায়না করতে পারে, তখন আমাকে দিদির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তার কাছে কিছু চাওয়া তো সত্যিই অযৌক্তিক, সে যে আমাদের খাওয়ানো পড়ানো করছে এই অনেক। তবু যে ইচ্ছে হয় অনেক কিছু। চৌদ্দ বছরের ছেলের পেট মিড ডে মিল ও রাতে অল্প খাবারে ভরে না। তার স্কুলে আসার আগে খিদে পায়, খাবার না পেলে সারা দিন কিছুতে মন লাগে না। কথা আর কি করে সুন্দর হবে বলো? তুমি তো বোঝো, তুমি কেন যে সবাইকে বলে দাও না, যে আমিও পড়তে চাই, আমি খারাপ ছেলে না! আমিও বড়দের সম্মান করি। যে ছেলে ঝড়ের রাতে বৃষ্টি ভেজা সকালে একটু খাবার, আর সংসারের একটু রোজগারের জন্য ভারি ভারি জল বয়ে আনে মাইলের পর মাইল রাস্তা, সে বাজে না। যার কাঁধ ভারি ভারি মোটা বোতল একতলা থেকে চারতলা তোলে, সে বাজে না। তুমি যে কেন ওই ঝড়বৃষ্টির রাতে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে বাবা, আমি আমার বায়না করার বটগাছটাই হারিয়ে ফেললাম। ওই ঝড়ঝাপটা যে আমার বটবৃক্ষকে উপড়ে নিয়ে গেল। এখন আমি নিরাশ্রয় বালক। কেউ বোঝেনা আমায়। তুমি তো জানো বাবা তোমার ছেলে ভালো হতে চেয়েছে। যাকে বলে ভদ্র ছেলে। আমি অষ্টম শ্রেণীতে উঠে গেছি। কবিগুরুর 'বোঝাপড়া' কবিতা আমাকে শিখিয়েছে বাবা- "ভালো মন্দ যাহাই আসুক ,সত্যেরে লও সহজে।" তাই আমি সব মেনে এগিয়ে যাচ্ছি। তবুও কান্না তো পায়।

Saraswati Puja: A Day for wisdom and learning

Ansh Paswan (Class VIII)

Saraswati Puja is an important festival celebrated in India and especially by students. It is dedicated to goddess Saraswati, the goddess of wisdom, knowledge and arts.The festival usually takes place in January or February and it holds great significance for all those who are involved in learning. Goddess Saraswati is usually shown sitting on a swan playing the Veena, and surrounded by books. She is believed to be the source of all knowledge and learning. People pray to her for blessings in their studies music and arts. On this day students and teachers gather in schools and homes to celebrate her and ask for her blessing in schools. Saraswati Puja is celebrated with much enthusiasm. Students keep their books and notebooks near the idol of goddess Saraswati. They offer flowers fruits and sweets and pray for good marks and success in exams. Everyone wears new clothes and enjoy the day with their friends and family. In many schools teachers also join the celebration to pray for wisdom and knowledge. In conclusion Saraswati Puja is more than just religious festival. It is a celebration of education and knowledge. It helps students to remember the importance of learning and motivate them to work hard for success.

চন্দননগরের ঐতিহ্যমন্ডিত জগদ্ধাত্রী পূজার অতীত ও বর্তমান
জিৎ সেন (নবম শ্রেণী)

আজ আমাদের চন্দননগরের যে জাঁক-জমকপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পূজা প্রত্যক্ষ করে অনাবিল আনন্দে মাতি, তার সূচনা হয়েছিল ১৭৫৭ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। সেখানে আজও মহা ধুম-ধামের সঙ্গে না হলেও এই পূজা হয়। তবে যিনি এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা সেই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়িটি আজ সামরিক জওয়ানের ব্যারাক। সেখানে কোনরকমে একটি টিউবলাইট জ্বেলে পূজোর নিয়ম রক্ষা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে চন্দননগরে এই পূজায় আলোর কোন অভাব নেই।

এই প্রশ্ন আমাদের সকলের মনে জাগে যে, জগদ্ধাত্রী পূজা নদীয়া জেলা থেকে চন্দননগরে কিভাবে এসেছিল? এই পূজা চন্দননগরে আসে ১৭৫৭ সালে যখন পলাশির প্রান্তরে মিরজাফরের চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মিরজাফর বাংলার নবাব রুপে পরিচিত হন।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হয়। সেই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী অবস্থায় শুধু একটি চিন্তাই করতেন, মা দুর্গা দূর্গতিনাশিণী আমায় কি এভাবে বন্দী হয়েই থাকতে হবে? তোমার আরাধনা কি করতে পারব না? অবশেষে তিনি যখন মুক্তি পেলেন তখন দুর্গাপূজা সমাপ্ত। তখন তিনি নদীপথে নিজের রাজ্যে ফিরছিলেন, তখন তিনি এক আশ্চর্য্য দেবী মুর্তি প্রত্যক্ষ করেন। আর মুখে শোনেন অভয়বাণী—"কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি এবার দূর্গাপূজা করতে পারনি বলে দুঃখ পেওনা। রাজ্যে ফিরে আগামী শুক্লনবমীতে আমার মুর্তি গড়ে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দ্বারা আরাধনা করো। আর এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তুমি স্বীকৃতি পাবে।"

দুর্গাপূজার ঠিক একমাস বাদে শুক্লনবমী তিথিতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই পূজা করলেন। এরপর হুগলী জেলার চন্দননগরে ফরাসি রাজত্বের সময় কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান মতান্তরে জামাতা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে হুগলী নদীর তীরে চাউলপট্টিতে এই পূজার সূচনা করেন ১৭৯৫ সালে। যুগ যুগ ধরে এই পূজা চন্দননগরে হয়ে চলেছে । এখন হুগলী জেলার আশেপাশে অবস্থিত চুঁচুড়া, মানকুণ্ড, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর ও রিষড়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা আজ সারা পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেছে। দূরদূরান্ত থেকে এমন কি বিদেশ থেকেও এখানে মানুষ আসে মা-জগদ্ধাত্রীর মূর্তি দর্শন করতে। এখনকার মুর্তি দেখতে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। তেমনি এখানকার প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে চন্দননগরে ২০০ টিরও বেশি জগদ্ধাত্রী পূজা হয়।

স্বপ্ন
সৌমিক সাহা (দশম শ্রেণী)

স্বপ্ন মানেই রাত আকাশে হারিয়ে যাওয়ার কথা
যেখানে থাকে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট আশা!
স্বপ্ন মানেই রূপকথার অচেনা এক দেশ,
স্বপ্ন মানে যেখানে কখনো হয়নাকো বিদ্বেষ।
স্বপ্ন যেখানে সুখ আর দুখ মিলে হয়ে যায় এক
স্বপ্ন হল গল্পে শোনা নকশী কাঁথার মাঠ
স্বপ্ন হল এক সেন্টিমেন্ট, স্বপ্ন হল আশা
স্বপ্ন মানে কাউকে খুব করে ভালোবাসা
স্বপ্নের গল্প বলতে গেলে হবে না কখনো শেষ
বাঙালির কাছে থেকে যাবে, এই কবিতার রেশ।

শুভম অধিকারী (দশম শ্রেণি)

থিয়েটারের ভৌতিক রহস্য

জয়দীপ রক্ষিত (দশম শ্রেণী)

থিয়েটার কথাটির সাথে আমরা সকলেই বিভিন্ন ভাবে পরিচিত। বিভিন্ন নতুন সিনেমা থিয়েটারেই সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায়, যা অনেকেই দেখতে যায়। আমিও অনেক সিনেমা থিয়েটারে দেখেছি, যা খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু থিয়েটারেও যে কোনো রহস্য থাকতে পারে, তা আমার কাছে ছিল একদমই অজ্ঞাত। তাও আবার এমন একটি থিয়েটার যেখানে সিনেমা চলার মতোই অত্যাশ্চর্য ঘটনারা ঘটে যেতে থাকে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যেকোনো সুচিন্তক মানুষের কল্পনাতীত। অনেকেই এই অনুভূতি উপলব্ধি করতে করতে সেই থিয়েটারে উপস্থিত হয় এবং অনেকেই অনেককিছু উপলব্ধিও করতে পারেন। এর আগেও লোকমুখে এই ঘটনা শুনলেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল আমার পক্ষে, তাই বিশেষ মাথা ঘামাইনি। কিন্তু একদিন মোবাইল ফোনে এই থিয়েটার আর সেখানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষীদের দেওয়া বিবরণের খুঁটিনাটি পড়ে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল তৈরী হয়। ক্রমশ কৌতূহল মাথায় চেপে জেদ হয়ে চেপে বসলে সিদ্ধান্ত নিই, একদিন নিজে গিয়েই এর ঠিকভুল বুঝে আসতে হবে।

মোবাইল থেকে আমি যেটুকু জানতে পারি তার সারমর্ম এই যে, "বীরসিংহ গ্রামে এমন এক থিয়েটার আছে যার শেষ থিয়েটার বা ছবি কিনা বেশ রোমহর্ষকর। সেখানে রাত্রি ৯ টা ৩০ মিনিটে সাহা ছবি শুরু হয় এবং শেষ হয় ১১ টা ৩০ মিনিটে, যা কিনা সেই গ্রাম এর জন্য গভীর রাত্রির সময়। শেষ থিয়েটার হলে সিনেমা শুরু হওয়ার পরমুহূর্তেই থিয়েটারের সামনে বা পিছনের দিকে শোনা যায় অপার্থিব আওয়াজ। অথবা কখনো কখনো সাদা বস্ত্র ধারণ করে কেউ ক্ষণমুহূর্তের জন্য দৃশ্যমান হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।'

এমন সংবাদ শোনার পর আমারও ইচ্ছা করে একবার হলেও সেখানে যাওয়া দরকার। তাই আমি ও আমার এক বন্ধু যার নাম আকাশ, আমরা দুজনে চলে যাই সেই থিয়েটারে এক রাতের শেষ সিনেমার টিকিট কেটে। টিকিটের মূল্য ছিল মাত্র ৫০ টাকা। যখন আমরা থিয়েটারে প্রবেশ করি তখন ভেতরে কেউ ছিল না এবং আমরা

ঢোকার পরেও কেউ আসেনি। বলতে গেলে আমরাই ছিলাম সেই থিয়েটারে একা। শুরুতে আমার একটু গা ছম-ছম করলেও সিনেমাটি দেখতে দেখতে কখন যে অর্ধ সময় অতিক্রান্ত হয়ে বিরতি শুরু হলে জানতেই পারি নি। এতক্ষন পর্যন্ত সমস্ত কিছু ভালো গেলেও, বিরতির পরের সময়ের জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ বাইরে যেন কিছু ভাঙচুরের আওয়াজ আসতে থাকে। আমরা অপ্রস্তুত ভাবে বাইরে গিয়ে দেখি কোথাও কিছুই নেই, না ভাঙচুরের কোনো লক্ষণ, না কোনো জনপ্রাণী। অথচ শব্দটা কিন্তু দুজনেই শুনেছি। আমরা পুরো বিস্মিত হয়ে যাই। মনে সাহস জুগিয়ে আবার থিয়েটারে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষন পর আবার একই শব্দ। এইবারে হলঘরের মধ্যে, একদম আমাদের পিছনেই। দুজনেই প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চমকে পিছনে তাকালাম। কিন্তু অবাককান্ড, সবটা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, কোথাও কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, যেন কিছু ঘটেইনি। অথচ কানে সেই প্রচন্ড আওয়াজের প্রতিধ্বনিটা এখনো রয়ে গেছে। বুঝে উঠতে পারছিনা কি হচ্ছে। এক অজানা অতিথির উপস্থিতি বেশ টের পাচ্ছি কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিনা। বুঝতে পারছি স্নায়ু বিকল হয়ে যাচ্ছে, হাত পা কাঁপছে। আর একমুহূর্তও এই জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়। যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল তাতে ভর করে বাইরে অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম, তারপর একবার পিছনে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির পথে রওনা দিলাম। কোনোরকমে সেদিন আমি ও আমার বন্ধু বাড়ি পৌঁছে যাই, ভগবানের আশীর্বাদে কারোর কোনো সমস্যা হয় না।

সমস্ত ঘটনা তোমাদের সাথে আলোচনা করে আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে, আমার ভাগ্যে চাক্ষুষ কিছু না হলেও অদৃশ্য ভাবে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিলো। পুরো রাত আমি এটা ভেবে ঘুমোতে পারি নি যে, সেই সময় কে ছিল! কেন ছিল! এবং কিভাবে সেই আওয়াজটি আমার কানে এলো? এই রহস্য আমার কাছে এক রহস্য হিসেবেই থেকে যাবে আজীবন। যা কোনো সাধারণ রহস্য নয়, ভৌতিক রহস্য.....।।

রাহুলের মোবাইল: আলো ও অন্ধকারের মধ্যে এক কিশোর

শান্তনু ঘোষ (সহ শিক্ষক)

বিজ্ঞান যখন মানুষের হাতে নতুন নতুন শক্তি তুলে দেয়, তখন সেই শক্তি আশীর্বাদ না অভিশাপ হবে–তা নির্ভর করে মানুষের ব্যবহারবোধের ওপর। সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন এমনই এক শক্তি, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরকে স্পর্শ করে আছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মোবাইল শুধু একটি যন্ত্র নয়; এটি তাদের সঙ্গী, তাদের জানালা, আবার কখনো কখনো তাদের একাকীত্বের আশ্রয়স্থলও। এই গল্প না সত্যি ঘটনাটি সেই প্রজন্মেরই এক প্রতিনিধির – রাহুলের।

রাহুল শহরতলির এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জমেছে স্বপ্ন, কৌতূহল আর অজানা জগতের প্রতি আকর্ষণ। ছোটবেলায় সে প্রকৃতি ভালোবাসত–খোলা মাঠ, আকাশের মেঘ, বিকেলের রোদ। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে তার ভালোবাসার ঠিকানাও। এখন সেই ভালোবাসা বন্দি একটি উজ্জ্বল পর্দার ভেতর।

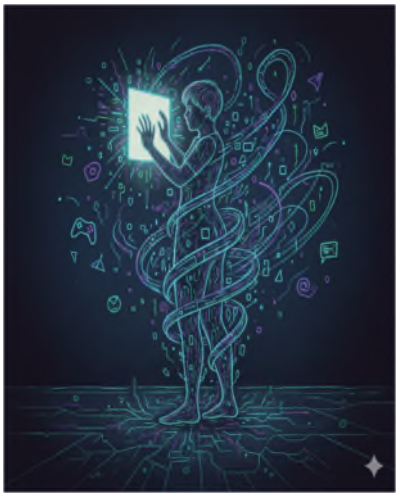

রাহুলের হাতে প্রথম স্মার্টফোন এসে যেন এক নতুন দরজা খুলে দেয়। সেই দরজার ওপারে ছিল অগণিত ছবি, ভিডিও, গেম আর মানুষের ভিড়। প্রথম প্রথম সে শিখেছিল অনেক কিছু। অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল, দূরের বন্ধুদের কাছাকাছি এনেছিল। মোবাইল তখন ছিল আলোর মতো–জ্ঞান আর সম্ভাবনার আলো।
কিন্তু আলো যত উজ্জ্বল হয়, ছায়াও তত গভীর হয়।

অজান্তেই রাহুল সেই পর্দার ভেতর ডুবে যেতে শুরু করল। দিনের পর দিন সে বাস্তবের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতেই বেশি সময় কাটাতে লাগল। রাত গভীর হলেও তার চোখ জেগে থাকত, স্ক্রল করতে করতে। তার চোখের

নিচে জমে উঠল ক্লান্তির ছাপ, মনের ভেতর জমতে লাগল অদ্ভুত এক শূন্যতা। বইয়ের পাতায় আর মন বসে না। পড়ার টেবিলে বসে থাকলেও মন ছুটে যায় মোবাইলের শব্দে। শিক্ষক যখন বোর্ডে অঙ্ক কষান, তখন রাহুলের মনে ভাসে গেমের লেভেল। সে ধীরে ধীরে নিজের থেকেই দূরে সরে যেতে থাকে। বাড়ির ভেতরেও পরিবর্তন ধরা পড়ে। মা লক্ষ্য করেন, ছেলে আগের মতো কথা বলে না। বাবা লক্ষ্য করেন, তার চোখে আর আগের উজ্জ্বলতা নেই। খাবার টেবিলে নীরবতা জমে ওঠে–মাঝখানে থাকে কেবল মোবাইলের নীল আলো।

একদিন পরীক্ষার ফল হাতে পেয়ে রাহুল যেন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। যে সে ছিল আত্মবিশ্বাসী, সে আজ সন্দিহান। শিক্ষক তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলেন,"রাহুল, তুমি হারিয়ে যাচ্ছ কেন?" এই প্রশ্নটি যেন তার ভেতরে গভীর ঢেউ তোলে। সে প্রথমবার ভাবতে শুরু করে–সে কি সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছে?

আগামী দশ দিন অন্যান্য ক্লাসের পরীক্ষা ও প্রযুক্তি মেলা থাকায় ছুটি থাকবে। তৃতীয় দিনে স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ আলোচনা সভা, বিষয়–প্রযুক্তি ও মানবজীবন। শিক্ষক বলেন, "প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে দ্রুত করেছে, কিন্তু গভীর করেছে কি?" এই কথাটি রাহুলের মনে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সে শিক্ষকের পরামর্শ চায় কিভাবে মোবাইলের কারণে তার ক্ষতি হচ্ছে? শিক্ষক কোনো বিতর্কে না গিয়ে তাকে শুধু এক সপ্তাহের জন্য মোবাইল থেকে দূরে থাকার প্রস্তাব দেন। রাহুল সে প্রস্তাবে চ্যালেঞ্জ করে বসে "একসপ্তাহ থাকা কোনো ব্যাপার না," অর্থাৎ পরবর্তী সাতদিন সে সম্পুর্ণ মোবাইল ছাড়া কাটিয়ে এর উত্তর খুঁজে দেখাবে। স্বাভাবিকভাবেই আর যে কোনো গোপনীয় বিষয়ের মতো এটাও সারা বিদ্যালয়ের সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। কেউ বললো, "অসম্ভব ", তো কেউ জানিয়েই দিলো, " দুদিনও থাকতে পারবেনা দেখিস"। রাহুল কিছু শুনল কিছু শুনলনা, স্ট্যাটাসে "৭দিন পর দেখা হবে" লিখে বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে মোবাইল আলমারিতে তালা বন্ধ করলো।

প্রথম দিন সকালে উঠেই অভ্যাসমত মোবাইল খুঁজতে হাত বাড়িয়ে রাহুলের মনে পড়ে গেলো তার চ্যালেঞ্জের কথা। স্থির হয়ে বসে চোয়াল শক্ত করে ভাবলো, এ আর এমন কি শক্ত, দেখতে দেখতেই সাতদিন কেটে যাবে। কিন্তু বাথরুমে ঢুকেই রাহুলের মন উশখুশ করতে লাগলো। খালি মনে হতে লাগলো 'আগের দিনের স্ট্যাটাসটা কতজন দেখলো কে জানে, কেউ কিছু রিপ্লাই করেনিতো'। দেখতে পেলে হয়ত এই অস্থিরভাবটা কাটতো। কিন্তু চাইলেও মোবাইল পাচ্ছেনা, বড়মুখ করে চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করেছে, মা সব জানে, আবার চোয়াল শক্ত করে বসে রইলো রাহুল। আজ থেকে সাতদিন ছুটির মধ্যে মোবাইল ছাড়া। উফফ কেন যে পাকামো মারতে হয় কে জানে। কিছুক্ষণ স্থির বসে থাকল কিন্তু সময় যেন কাটছেনা। হাত খালি, মন অস্থির। সে বুঝতে পারছে, মোবাইল ছাড়া থাকা কতটা কঠিন হয়ে গেছে। আলমারিতে তালাবন্ধ মোবাইলের কথা ভেবেই তার হৃদয় সমস্ত দিন আকুলি বিকুলি করতে থাকে। রাতে কোনরকমে খেয়ে শুয়ে পড়ে সে।

দ্বিতীয় দিনে সমস্যা আরো বাড়ে। সকাল থেকে তার খালি কান্না পাচ্ছে, যেন শরীর থেকে একটা অঙ্গ চলে গেছে। আসক্তি এই পর্যায়ে চলে গেছে যে সে অন্য কিছু ভাবতেই পারছেনা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণের অসহ্যকর অবস্থা একসময় সহ্য হয়ে যায়। রাহুলেরও অসহায়তা পরিবর্তিত হয়ে হতাশার রূপ নেয়। তারপর হঠাৎ মনে হয় সময় যেন স্থির হয়ে গেছে, একেকটা মুহূর্তও যেন একেকটা বছর। সে আশ্রয় নেয় জানালায়। নীলচে আকাশে সাদা সাদা মেঘ ছন্নছাড়া হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় রাস্তায় মানুষের মাথার ভিড় শুধুই চলে যাচ্ছে। কি ভীষণ তাড়া। কারুর একমুহূর্ত সময় নেই। শুধু একটা আইস্ক্রিম-ওয়ালা একজায়গায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। দুটো কাক নিজেদের মধ্যে গম্ভীর স্বরে আলোচনা করছে। একটা শালিক কারুর উপর প্রচণ্ড রেগে চিৎকার চেঁচামেচি করে তেতুঁল গাছটার ডালে গিয়ে বসলো। পাশের বাড়ির জেঠিমা তারস্বরে টিভিতে সিরিয়াল দেখছে। সবাই ব্যস্ত, শুধু তার জীবনটাই যেন থমকে গেছে। বিরক্ত হয়ে সে সকালের খবরের কাগজটা টেনে নিল, প্রথমপাতায় খবর গুলো বোরিং, পরের পাতাগুলো উল্টে সে হঠাৎ থমকে

দাঁড়ালো একজায়গায়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে একটি খবর, প্রথমে আলগোছে পড়তে শুরু করলেও কিচ্ছুক্ষণের মধ্যেই লেখার মধ্যে ডুবে যায় সে। একে একে অন্য বিষয়ের খবর গুলোও পড়ে নেয়। পাশের পাড়াতেই নাকি চুরি হয়েছে পর পর তিনটে বাড়িতে গত পরশু। কই সে তো কিছু শোনেনি। অনেকদিন বাদে সে পেপার পড়ল। দেশবিদেশের অনেক অজানা খবরের হদিশ পেয়েছে সে। মনটা কিছুটা স্থির হয়েছে বটে কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে পারবেনা ভেবে সোজা গেলো মায়ের কাছে। মাও এতরকম খবর শুনে অবাক, তারচেয়েও বেশি খুশি হলেন আজ অনেকদিন বাদে তার ছেলে তার সাথে মন খুলে কত কথা বলছে দেখে। বিকেলের দিকে রাহুল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখে–সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তেঁতুলগাছটায় পাখির মেলা। এত রকমের পাখি আমাদের এখানে আছে? আকাশটা ক্রমশ লালচে থেকে বেগুনি হয়ে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে ভাবে, কতদিন সে এই দৃশ্য দেখেনি! আকাশের রঙ বদলানোর সেই নীরব নাটক তার মনে প্রশান্তি এনে দেয়। আজ পড়ার বই শেষে সায়েন্স ফিকশন বই নিয়ে সে বসে পড়ে। পড়তে পড়তে পাতার শব্দ, গল্পের আবেশ তাকে টেনে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে–যেখানে কোনো নোটিফিকেশন নেই, কোনো তাড়া নেই।

পরের দিন তার ঘুম ভাঙে একটু সকাল সকালেই। সারাদিন স্কুলের সমস্ত পিরিয়ড গুলোর কথা ভাবে সে, বন্ধুদের সাথে করা খুনশুটি, স্যারদের অঙ্গভঙ্গি, পড়ানো, সব মনে করে বেশ উপভোগ করতে থাকে সে। বিকালে মাঠে খেলতে যায়। মাঠে তাকে এতদিন বাদে দেখে সবাই যতটা অবাক , ততটাই আহ্লাদিত। চুটিয়ে ফুটবল খেলে সে। বহুদিন বাদে সে অনুভব করে শরীরের ক্লান্তি, জীবনের নোনতা স্বাদ। বন্ধুদের হাসি, ঘামের গন্ধ–সবকিছুই তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে জীবিত। সেদিন রাতে ডিনারে বসে বাবাকে সব গল্প করে শোনায় সে। বিছানায় শুয়ে ভাবে সত্যিইতো কতকিছু মিস করছিলো সে নিজের অজান্তেই। ঠোঁটের কোণায় স্নিগ্ধ স্মিত হাসি নিয়ে নিদ্রাজগতে পাড়ি দেয়।

চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিনও রাহুলকে হতাশ করলোনা। নিজের আশেপাশের জগতটা যেন হঠাৎ করে ভীষণ নতুন রকম আবিষ্কার করেছে সে। এই কদিনে সে পিকনিক করেছে, নতুন উপন্যাস পড়েছে, মায়ের সাথে হারমোনিয়াম বাজিয়েছে, বাবাকে দাবাতে হারিয়েছে, পাড়ার বন্ধুদের সাথে মিলে পাড়ার সমস্ত জঞ্জাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার করেছে, অনাথ বাচ্চাদের অঙ্ক শিখিয়েছে, এককথায় সে নিজেও ভাবতে পারছেনা এতকিছু সে পারত। পাড়ায় তার যথেষ্ট সুনাম ছিলই, এখন তার ব্যবহারেরও সকলেই প্রশংসা করছে। সে নিজেও অভিভূত। এই কদিন তার আশেপাশে অনেকেই মোবাইল নিয়ে তার সামনে এসেছে, কিন্তু তার বিশেষ কোনো আকর্ষণ বোধ হয়নি। অথচ এক সপ্তাহ আগেও সে মোবাইল ছাড়া চলতেই পারত না।

এরপর আসে সপ্তম ও শেষ দিন। ঘুম থেকে উঠে বসে রাহুল সেদিন একটু অন্যমনস্ক। তার মোবাইল তালাবন্ধ আলমারি থেকে তার খাটের পাশে পুনর্বহাল হয়েছে। রাহুল একবার তার মোবাইলটা দিকে তাকিয়ে দেখে,মুচকি হাসে। সমস্ত সপ্তাহটা যেন তারকাছে একটা স্বপ্নের মত। এই এক সপ্তাহে রাহুল অনেক আলাদা করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন সে বেশ বোঝে, মোবাইল তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, শুধু মানুষের কাছ থেকে নয়, নিজের কাছ থেকেও। সে সোজা বাথরুমের দিকে রওনা হয় নিজেকে তৈরি করতে। কাল তার বিদ্যালয়ে তাকে জানাতে হবে, এই এক সপ্তাহে তার কি পরিবর্তন হয়েছে, কি উপলব্ধি হয়েছে। লেখাটা প্রায় হয়ে গেছে, শুধু উপলব্ধিটুকু লিখতে হবে। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় রাহুলের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

রোজকার নিয়মমাফিক পরা স্কুল ইউনিফর্মেও পরদিন রাহুল যেন আলাদা এক ছাত্র। বিদ্যালয়ে সকলেই তার মোবাইল চ্যালেঞ্জের কথা জানত, সাতদিন পর তাই সবাই উদগ্রীব হয়েছিল সে কেমন আছে জানতে। অবশেষে নোটিশ বোর্ডে তার লেখা টাঙানো হয় আর সে লেখা পড়তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্কুলের ছাত্ররা। এক সপ্তাহ শেষে সে লিখেছে অনেককিছুই কিন্তু শেষ করেছে এইভাবে–"মোবাইল আমার জীবনকে আলোকিত করেছে ঠিকই, কিন্তু আমি সেই আলোতেই নিজের ছায়া হারিয়েছিলাম। এই উপলব্ধি আমাকে নতুন পথ দেখিয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রযুক্তি থাকবে আমার জীবনে, কিন্তু আমি তার দাস হব না। আমি শিখে নেবো সীমারেখা টানতে–সময়ের, প্রয়োজনের, মনোযোগের।"

এরপর একযুগ কেটে যায়। সে ঘটনার পর অনেকের কাছেই হিরো হয়ে যায় রাহুল। তবে রাহুল কিন্তু সেই স্যারকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছিল। আসলে স্রোতে বয়ে যাওয়া খুব সহজ, খুব কঠিন স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানো। সকলে পারেনা নেশার বিরুদ্ধে যেতে, তাই ভাবে এটা অসম্ভব। রাহুল প্রমাণ করেছিল, সম্ভব অসম্ভব সবটাই আমাদের ইচ্ছে। আজ রাহুল জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সে বড় অফিসের কর্ণধার। এখন সে আগের থেকেও বেশি আধুনিক। কিন্তু এখনো সে মোবাইল ব্যবহার করার সারমর্ম ভুলে যায়নি। সে শেখে, জানে, প্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার করে তারপর সেটাকে অন্য সাধারণ জড়ো বস্তুর মতোই একজায়গায় সযত্নে রেখে দেয়, প্রাণভোমরা করে তোলেনা। সন্ধ্যায় সে আকাশের দিকে তাকায়, বইয়ের পাতায় ডুবে যায়, মানুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলে।

এই গল্প এক রাহুলের নয়। এই গল্প বর্তমান প্রজন্মের–যারা মোবাইলের আলোয় বড় হচ্ছে, কিন্তু সেই আলোর আড়ালে ছায়ার অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার সাহস করতে পারছেনা। মোবাইল বাঁধন হয়ে জিতে যাচ্ছে। আর হেরে যাচ্ছে অগণিত রাহুলেরা।

বর্তমান প্রজন্মের ওপর মোবাইলের প্রভাব অপরিসীম।মোবাইল আমাদের হাতে শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তিকে বুদ্ধি ও সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারলেই তা জ্ঞানের দরজা খুলে হয়ে উঠবে আশীর্বাদ। নইলে সেই আলোই একদিন আমাদের চোখ ঝলসে দেবে। সীমাহীন ব্যবহার আমাদের মন, শরীর ও সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই প্রয়োজন ভারসাম্য। বর্তমান প্রজন্মের সামনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা–প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা, কিন্তু তার ভেতর হারিয়ে না যাওয়া। মোবাইল থাকবে আমাদের জীবনে, কিন্তু আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক হবে না। এই বোধই পারে একটি সুস্থ, সচেতন ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে।

The Restless Mind and the Lost Art of Attention

Saurabh Mukhopadhyay, Asst. Teacher

Every human being is gifted with a mind, yet ironically, it is this very mind that often becomes the master instead of the servant. The mind is like a small child — curious, stubborn, impatient and endlessly demanding. The moment one desire is fulfilled, another rises immediately. It whispers, "Let me play," "I don't want to study," "Give me the phone," "I won't listen anymore." Though the mind lives within us, most of the time it governs our actions, emotions, and decisions.

The greatest strength of the mind is its power of attention. But the modern world is slowly and silently stealing it away. From dawn to dusk, our minds are surrounded by distractions, temptations and digital traps. A single message, a single image, a short video is enough to pull us away from our own inner world. We move restlessly from one attraction to another, until finally the mobile screen becomes the ruler of our time, thought and identity.

While we may succeed in copying answers in an examination hall, life itself conducts far more serious examinations — tests of patience, discipline, honesty and wisdom. These cannot be passed by

shortcuts or tricks; only focused attention and deep thinking can guide us through them. Sadly, we have spoiled our minds so much that even reading a single page feels tiring, and listening to one idea fully seems unbearable. We rush from one pleasure to another without ever experiencing the joy of completeness.

As a result, we hear half, understand half, and then express loud opinions. When the ability to think deeply is lost, blind judgement takes its place. That is why much of today's knowledge resembles the famous story of blind men trying to describe an elephant — each touches only a part and assumes it to be the whole. Thus, our world is increasingly filled with half-educated minds and empty wisdom.

We now live in a time where ideals are fading, logic is ignored, truth is sacrificed for popularity, and peace is rarely chosen over noise. Our minds have become obedient slaves of advertisements, propaganda and instant pleasure. From morning till night, we live like others, think like others, desire like others, and even suffer like others.

This is why the crisis of our age is not the lack of intelligence, but the absence of mindful living. The world today is not short of smart people, but of deep thinkers, calm souls and attentive hearts. Only when we control our mind can we take control of our life.

এই সময়

কোমর বাঁধছে দেশ

আজ মকড্রিল চলবে মোট ২৬৯ জায়গায় ■ বাংলায় মহড়া ১৭ জেলায়

সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রস্তুতি শেষমুহূর্তের

অভিযোগ জানাতে গিয়ে মুখ পোড়াল পাকিস্তান

সব রকম অনুদানই বন্ধ হবে 'অবাধ্য' হার্ভার্ডের?

যে পথে মোকাবিলার প্রস্তুতি

চারুলিপি বা ক্যালিগ্রাফি: হাতে লেখা সংবাদপত্র, পিংকি দাস (সহ শিক্ষিকা)

মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া

ড: সোমনাথ চ্যাটার্জি, (প্রধান শিক্ষক)

আজকের দিনে মোবাইল ফোন ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন কল্পনাই করা যায় না। কথা বলা, পড়াশোনা, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্যবহার–সব কাজই এখন একটি ছোট যন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই আধুনিক স্মার্টফোন একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোবাইল ফোনের ধারণা প্রথম আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী যোগাযোগের জন্য বড় আকারের রেডিও যন্ত্র ব্যবহার করত। তবে হাতে ধরে কথা বলার মতো মোবাইল ফোন প্রথম তৈরি হয় ১৯৭৩ সালে। আমেরিকার বিজ্ঞানী মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল ফোন থেকে কল করেন। সেই ফোনটির নাম ছিল Motorola DynaTAC। এটি ছিল খুব বড় ও ভারী এবং ব্যাটারি খুব অল্প সময় চলত। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে মোবাইল ফোন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে। প্রথম দিকে ফোন দিয়ে শুধু কথা বলা যেত। পরে 2G প্রযুক্তি চালু হলে মেসেজ পাঠানোর সুবিধা আসে। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে স্মার্টফোনে রূপান্তর ঘটে ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে। ১৯৯৪ সালে IBM Simon নামে প্রথম স্মার্টফোন তৈরি হয়। এতে টাচস্ক্রিন, ক্যালেন্ডার ও ইমেল ব্যবহারের সুবিধা ছিল। ২০০৭ সালে অ্যাপল কোম্পানি প্রথম iPhone বাজারে আনে। এই ফোনটি স্মার্টফোনের জগতে এক নতুন বিপ্লব ঘটায়। সম্পূর্ণ টাচস্ক্রিন, অ্যাপ ব্যবহার ও ইন্টারনেট সুবিধা মানুষের জীবনধারাকে বদলে দেয়। এর পরে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালু হয় এবং বিভিন্ন কোম্পানি স্মার্টফোন তৈরি করতে শুরু করে। এখন স্মার্টফোনে ক্যামেরা, ভিডিও কল, অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল পেমেন্ট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে 4G ও 5G প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। স্মার্টফোন এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি শক্তিশালী জ্ঞান ও তথ্যের ভাণ্ডার।

ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন ধরনের স্মার্টফোন আমাদের জীবনে আসবে।

বর্তমান যুগকে বলা হয় প্রযুক্তির যুগ। স্মার্টফোন ব্যবহার না করতে পারলে বা কাছে না থাকলে সব কিছু ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় আমাদের সবার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করতে আমরা সবাই কম বেশি অভ্যস্ত।এই যুগে মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, বিনোদন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার খুবই বেশি। তাই আজকের দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে–মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার কি আমাদের অলস, স্বার্থপর ও অসামাজিক করে তুলছে?

মোবাইল ফোন আমাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে। অনলাইন ক্লাস, ইউটিউবের শিক্ষামূলক ভিডিও, ই-বুক, অনলাইন কুইজ ও পরীক্ষার প্রস্তুতি–সবই এখন মোবাইলের মাধ্যমে সম্ভব। দূরে থাকা বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ রাখা যায়। অনেক সময় জরুরি পরিস্থিতিতেও মোবাইল ফোন আমাদের বড় সাহায্য করে। তবে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের জীবনে কিছু সমস্যাও তৈরি করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে মোবাইলে গেম খেলা বা ভিডিও দেখার ফলে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। এতে শরীর দুর্বল হচ্ছে এবং কাজ করার ইচ্ছাও কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীরা অলস হয়ে পড়ছে। একই সাথে অনেক গবেষণাই বলে মোবাইল ফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে পারে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক —

- ঘন ঘন নোটিফিকেশন, গেম, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি শিক্ষায় মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
- দীর্ঘ সময় স্ক্রিন দেখলে চোখের চাপ, ঘুম কম হওয়া ও স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়।

- সামাজিক যোগাযোগ কমে যেতে পারে এবং বাস্তব জীবনে মুখোমুখি কথোপকথন কমে যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি বা ভিডিও পোস্ট করে লাইক ও কমেন্ট পাওয়ার আগ্রহ অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। অনেক সময় নিজের প্রচারেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে অন্যের অনুভূতি, সমস্যা বা কষ্টের দিকে নজর কমে যেতে পারে। এই অভ্যাস থেকে স্বার্থপর মনোভাব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আজকাল দেখা যায়, পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে থাকলেও প্রত্যেকে নিজের মোবাইলে ব্যস্ত, এমনকি বাসে ট্রেনে সবাই পাশাপাশি বসে কিন্তু কেউ কোনও কথা না বলে মাথা হেঁট করে মোবাইল এ মগ্ন। বাবা-মা বা ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলার সময় কমে যাচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলাধুলার বদলে অনলাইনে কথাবার্তাই বেশি হচ্ছে। এর ফলে মুখোমুখি কথা বলার অভ্যাস কমে যায় এবং মানুষ ধীরে ধীরে একাকিত্ব অনুভব করে।

আসলে মোবাইল ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া নিজে খারাপ নয়। আমাদের ব্যবহারই সেটাকে ভালো বা খারাপ করে তোলে। অনেক ছাত্রছাত্রী মোবাইলের সাহায্যে নতুন ভাষা শিখছে, বিজ্ঞান জানছে, সমাজসেবামূলক কাজ করছে। তাই সচেতনভাবে ব্যবহার করলে প্রযুক্তি আমাদের উন্নতির পথও দেখাতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা খুবই দরকার–

· পড়াশোনার সময় মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধ রাখা

· প্রতিদিন কিছু সময় মোবাইলএ ভিডিও গেম না খেলে বাস্তবে খেলাধুলা করা

· পরিবারের সঙ্গে ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা ও সময় কাটানো

· বই পড়া ও সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকা

· ভালো ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেখা

২০০৭ সালে তোলা ছবিতে মার্টিন কুপার ১৯৭২ সালের মোটোরোলা কোম্পানির তৈরি একটি হাতে ধরা মোবাইল ফোনের প্রোটোটাইপ হাতে ধরে আছেন।

এই অভ্যাসগুলি গড়ে উঠলে মোবাইল আমাদের ক্ষতি করবে না। বর্তমান সময়ে শিক্ষা অ্যাপ ও অনলাইন লার্নিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্মার্টফোন শিক্ষার্থীদের কাছে এক সত্যিকারের শিক্ষার বন্ধু হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষা অ্যাপে পাঠ্যবইয়ের অধ্যায়, ভিডিও লেকচার, অ্যানিমেশন, কুইজ ও অনুশীলনী সহজ ভাষায় দেওয়া থাকে, যা পড়াশোনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই পাঠ শুনতে পারে এবং প্রয়োজনে সেই পাঠ বারবার দেখে বুঝে নিতে পারে। এছাড়া ই-বুক, অনলাইন নোট, ডিকশনারি ও শিক্ষামূলক ভিডিও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। এইভাবে সঠিক উদ্দেশ্যে ও নির্দিষ্ট সময়ে স্মার্টফোন ব্যবহার করলে তা সময় নষ্টের কারণ না হয়ে পড়াশোনায় সহায়ক একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, মোবাইল ফোন আমাদের জীবনের প্রভু নয়, সহায়ক। আমরা যদি প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি, তবে তা আমাদের অলস বা অসামাজিক নয়, বরং জ্ঞানী, সচেতন ও ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবে।

08.01.2026 11:37

08.01.2026 12:15

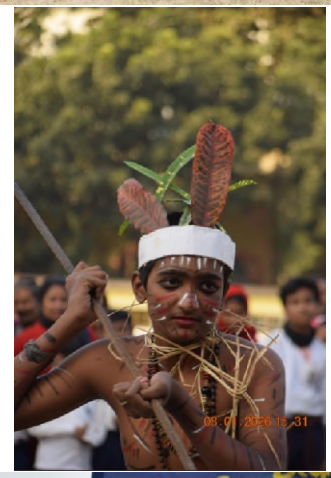

08.01.2026 12:21

বিদ্যামন্দির
বিভাগ
হুগলী
08.01.2026 16:18

Unforgettable Throwback, Some Moments Never Grow Old

চন্দননগর
কানাইলাল বিদ্যামন্দির
- ফরাসী বিভাগ -
স্থাপিত - ১৮৬২
বড়বাজার • চন্দননগর • হুগলী
08.01.2026 16:37

09.01.2026 12:24

09.01.2026 13:03

09.01.2026 13:15

09.01.2026 13:38

09.01.2026 13:43

Recognition of Heritage at the SPECIAL COVER RELEASE CEREMONY

To commemorate the educational and cultural legacy of the historic institution Chandernagore Kanailal Vidyamandir (French Section), a Special Cover release ceremony was held on Thursday, 9 January 2026

The programme formally began at the premises of the Chand-*ernaagore* Head Post Office and was followed by a the-tailed ed ceremonial programme at Rabindra Bhavan, Chandernagore

The event was graced by the presence of the Hon'ble Mayor of Chandernagore Municipal Corporation, the Hon'ble Commi-sciones, the Mayor-in-Council Member (Education), senior offi-cials of the Department of Posts, the President of IAA—an official partner of UNESCO—along with the Headmaster of the school, other teachers, students, and guardians. The ceremony was formally inaugurated with the lighting of the ceremonial lamp.

This Special Cover highlights the school's long history, its French educational heritage and the proud tradition of the CEPE (French) examination system that continues to this day. In their addresses, the speakers remarked that through the release of the Special Cover, not only an educational institution, but the broader Indo-*French* eccational history of Chandernagore has received recognition at the national level.

Officials of the Department of Posts noted that the Special Cover would be a valuable addition for philatelists and history enthisisasis. The school *authorities* expressed their gratitude to the Department of Posts, and all concerned for this honour and emphasized the imporiance of preserving this heritage for future generations.